بسم الله الرحمن الرحيم

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)- এর ৩রা জুলাই, ২০১৫ তারিখের জুমুআর খুতবা

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা আমাদের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত আদেশ-নিষেধ নাযিল করেছেন সেগুলো স্মরণ রাখা, এর পুনরাবৃত্তি করা এবং অন্যদেরকে স্মরণ করানোর দায়িত্ব যাদের রয়েছে তা স্মরণ করানো মু'মিনদের জামাতের কাজ বা বৈশিষ্ট্য। এসব আদেশ-নিষেধ অন্যদের স্মরণ করানো বা স্মরণ করাতে থাকা অর্থাৎ 'যাদের ওপর স্মরণ করানোর দায়িত্ব' এটা বলতে আমি মুরুব্বী নয়তো ওহ্দাদার বা পদাধিকারীদের বুঝিয়েছে। আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ কৃপায় জামাতী নিযাম বা ব্যবস্থাপনায় কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনা বা সংগঠন ছাড়াও অঙ্গসংগঠনের ব্যবস্থাপনাও রয়েছে। এছাড়া জামাতী কেন্দ্রীয় সংগঠনেও এবং অঙ্গ-সংগঠনগুলোতেও দেশীয় বা কেন্দ্রীয় পর্যায় থেকে আরম্ভ করে স্থানীয় বা হালকা পর্যায়েও পদাধিকারী নিযুক্ত রয়েছে। আর প্রত্যেক পদাধিকারীর কাছে এই প্রত্যাশা করা হয় যে, সে খিলাফতের সাহায্যকারী হয়ে সেসব আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করবে যা বৃহত্তর পরিসরে খিলাফতেরই দায়িত্ব।

অতএব একথা যদি সকল মুরুব্বী এবং ওহ্দাদারগণ অনুধাবন করে তাহলে জামাতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে পারে। খোদা তা'লার আদেশ-নিষেধ বা শিক্ষা অন্যদের স্মরণ করানো বা এই চেতনাবোধ জাগ্রত হওয়া যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাকে স্বেচ্ছায় বা পুরোজীবন উৎসর্গ করে জামাতের সেবা করার যে তৌফিক দিয়েছেন এর সুবাদে সর্বপ্রথম আমার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমি নিজে কতটা খোদা তা'লার নির্দেশ শিরোধার্য করে সেই দৃষ্টান্ত স্থাপনের চেষ্টা করছি, এক খিদমতকারী ব্যক্তির দায়িত্ব হলো অন্যদেরকে এসব আদেশ-নিষেধ স্মরণ করানোর জন্য যোগ্যতা অর্জন করা। আমি যদি কেবল অন্যদেরকে স্মরণ করাই কিন্তু আমার নিজের ব্যবহারিক আচরণ এর পরিপন্থী বা এর বিপরীত হয় তাহলে এটি সত্যিই ভয়ের বিষয় আর এ জন্য ইস্তেগফারের প্রয়োজন রয়েছে। এমনিতেও ইস্তেগফার করা উচিত কিন্তু এই দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি ইস্তেগফারের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে আমাদের সবার সামনে এটিও স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, কোন ওহ্দাদার বা পদাধিকারীর এটি মনে করা উচিত নয় যে, নসীহত করা আমার কাজ নয়। এটি কেবল জামাতের আমীর, জামাতের প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, মুরুব্বী বা দু'একজন অন্য সেক্রেটারীর কাজ বা আনসারুল্লাহ্র সদর বা তাঁর তরবীয়ত বিভাগের কাজ বা খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদর বা তাঁর তরবীয়ত বিভাগের দায়িত্ব বা লাজনার প্রেসিডেন্ট ও তাঁর তরবীয়ত বিভাগের দায়িত্ব। না! বরং প্রত্যেক সেক্রেটারী, তা সে সেক্রেটারী যিয়াফত হোক বা অঙ্গ-

সংগঠনগুলোতে খিদমতে খালক বা ক্রীড়া বিভাগের তত্ত্বাবধয়াক হোক; যে-ই হোক না কেন সে যদি কোন না কোন জামাতের সেবায় নিযুক্ত থাকে বা জামাতের দায়িত্ব পালন করে, তাহলে তার দায়িত্ব হলো, দৃষ্টান্ত স্থাপন করা। যদি এটি অর্জন হয় তাহলে যেমনটি আমি পূর্বেও বেশ কয়েকবার বলেছি, জামাতের শতকরা পঞ্চাশ ভাগের বেশি আল্লাহ্ তা'লার ফযলে খোদার নির্দেশ মান্যকারী হতে পারে। তা মসজিদে নামাযের উপস্থিতি সংক্রান্ত হোক বা অন্যান্য কুরবানী এবং মানুষের প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের সাথে সম্পর্কযুক্ত বিষয়ই হোক না কেন। অতএব জামাতের সকল পর্যায়ে খিদমতকারীর প্রথমত নিজের ভেতরে উঁকি মেরে দেখা উচিত, এ সকল আদেশ-নিষেধ আমি নিজে কতটা মেনে চলছি এবং এর সহায়তায় নিজের অবস্থা উন্নত করা উচিত এবং এরপর অন্যদের নসীহত করা উচিত।

অনুরূপভাবে প্রত্যেক আহমদীরও দায়িত্ব, যে এই দাবী করে, আমি আমার জীবনে পবিত্র পরিবর্তন আনয়নের জন্য হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করেছি, তার উচিত হবে, আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী এবং আদেশ-নিষেধের প্রতি দৃষ্টি দেয়া এবং এর পুনরাবৃত্তি করা আর বারংবার এগুলোকে সামনে নিয়ে আসা। যদি আমরা এরূপ করা আরম্ভ করি তাহলে আমরা এক মহা বিপ্লব আনয়ন করতে পারি আর এতে শুধু আমাদেরই আত্মসংশোধন হবে না বরং আমরা পৃথিবীকেও প্রকৃত চারিত্রিক মানদন্ড সম্পর্কে অবহিত করতে সক্ষম হব। অতএব এদিকে আমাদের বিশেষভাবে মনোযোগ দেয়া আর আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা বা আদেশ-নিষেধ সন্ধান করে সেগুলো মেনে চলা উচিত।

গত খুতবায় আমি কিছু বিষয়ের উল্লেখ করেছিলাম যা এক মু'মিনের বিশেষত্ব হওয়া উচিত। আজও আমি কিছু বিষয় উপস্থাপন করব। রমযান মাস বান্দার সংশোধনের অনেক বড় একটি সুযোগ নিয়ে আসে। এ মাস যেখানে আমাদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের মাস সেখানে আমাদের দুর্বলতার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ এবং সংশোধনের মাসও বটে। তাই এ মাসে আমাদের নিজেদের দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিত করে, খোদা তা'লার নির্দেশাবলী মেনে বা সেগুলো শিরোধার্য করে আত্মসংশোধনের সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত। যদি আমরা এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা না করি তাহলে রমযানের সেহ্‌রী এবং ইফতারীই কেবল খাচ্ছি বা উপভোগ করছি। কার্যতঃ এর কোন প্রভাব আমাদের ওপর পড়বে না যা আমাদের আধ্যাত্মিক এবং শিক্ষাগত বা তরবিয়তী মানকে উন্নত করতে পারে। আর এটি তেমনই হবে যেভাবে কতক লোক সম্পর্কে কৌতুক প্রসিদ্ধ আছে যে, রোযা রেখেছে কিনা জিজ্ঞেস করলে তারা অজুহাত দেখায়, নফল এবং তারাবীর কথা বললে বিভিন্ন অজুহাত প্রদর্শন করে, নামায পড়া সম্পর্কে যদি বলা হয় যে, বাজামাত নামায পড় তাহলে তারা অজুহাত দেখায় আর ইফতারী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে বলে যে, হ্যাঁ-হ্যাঁ অবশ্যই করব। আমরা কাফিরতো নই যে, ইফতারীও করব না। অতএব আমাদের এমন মু'মিন হওয়া

উচিত নয়। যাদের অবস্থা এমন তারাই ধর্মকে হাসি-ঠাট্টার লক্ষ্যে পরিণত করে আর এটি কৌতুকের চেয়ে বেশি মুসলমানদের শোচনীয় অবস্থারই চিত্র।

আল্লাহ্ তা'লা এদের প্রতি করুণা করুন; কিন্তু হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মান্যকারীদের মান অনেক উঁচু এবং উন্নত হওয়া উচিত। কোন বৈধ কারণ ছাড়া রোযা ছুটে যাওয়া উচিত নয় আর অনুরূপভাবে রমযানে ইবাদতের যে উদ্দেশ্য সেটিও সর্বোত্তমভাবে পালনের চেষ্টা করা উচিত। একইভাবে রমযানের সাথে কুরআনও বেশি বেশি পাঠ করা সুন্নত। হযরত জিব্রাঈল (আ.) রমযানে মহানবী (সা.)-কে বিশেষভাবে পুরো কুরআন পাঠ করে শোনাতেন। তাই কুরআন তিলাওয়াতের প্রতি আমাদের প্রত্যেকের বিশেষভাবে মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত আর এর ভেতর থেকে বিভিন্ন আদেশ-নিষেধ সন্ধান করে তা শিরোধার্য করার চেষ্টা করা উচিত। তারাবীর নামায হয়ে থাকে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটি ফরয নামায নয়। হযরত ওমর (রা.)-এর যুগে এর প্রচলন হয়েছে যেন যারা তাহাজ্জুদ পড়তে পারে না তাদের নফল ইবাদতের সুযোগ সৃষ্টি হয় আর ক্বারীর মাধ্যমে কুরআন করীম শোনারও সুযোগ পায়। কিন্তু যারা তাহাজ্জুদে উঠতে পারে তাদের তাহাজ্জুদও পড়া উচিত।

আজকাল সময় যেহেতু খুব সংক্ষিপ্ত তাই অল্প হলেও পড়া উচিত বা যারা রোযা রাখার জন্য জাগ্রত হয় তারা কিছুক্ষণ পূর্বেই জাগ্রত হয়। তাই আজেবাজে কথায় সময় নষ্ট না করে নফল পড়া উচিত। তারাবী রোযার জন্য আবশ্যকীয় কোন শর্ত নয়। আর তাহাজ্জুদ যদিও আবশ্যকীয় শর্ত নয় কিন্তু নফল অবশ্যই পড়া উচিত। মু'মিনদেরকে সাধারণভাবে বছরের অন্যান্য সময়ও তাহাজ্জুদ পড়ার নসীহত করা হয়েছে বা নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এই বিষয়টি স্পষ্ট করার কারণ হলো, কেউ আমাকে বলেছে, রোযাদারের জন্য হয়তো অন্ততপক্ষে আট রাকাত তাহাজ্জুদ বা তারাবী পড়া আবশ্যক। তাই আমি স্পষ্ট করতে চাই যে, তাহাজ্জুদ বা তারাবীহ্ রোযার কোন আবশ্যকীয় শর্ত নয়। তবে হ্যাঁ, ইবাদত করা উচিত, যখনই সুযোগ হয় নফল পড়া উচিত। আর আসল বিষয় হলো, রোযার সাথে কুরআন তিলাওয়াত করা যা সুন্নত। তাই সবার বেশি বেশি কুরআন পাঠের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হওয়া উচিত।

আর আমি যেমনটি বলেছি, নামায এবং ইবাদত তো এমনিতেই প্রত্যেক মু'মিনের জন্য ফরয বা আবশ্যক। অবশ্য রমযানে এসব ইবাদত এবং নামাযকে আমাদের আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করে তোলার চেষ্টা করা আর অনুরূপভাবে যথাসম্ভব যিক্‌রে ইলাহীতে রত থাকা উচিত।

অতএব এই পরিবেশে অর্থাৎ রমযান মাসে এই চেষ্টা করা উচিত যে, যদি আমাদের ভেতর নামায এবং ইবাদতের ক্ষেত্রে পূর্বে কোন দুর্বলতা থেকে থাকে তাহলে আমরা তা দূরীভূত করে এই উদ্দেশ্যে এদিকে মনোযোগ দিব যে, এই গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশকে আমরা রীতিমত আমাদের

জীবনের অংশ করে নিব। শুধু রমযানেই এই নির্দেশকে শিরোধার্য করব না বা এ নির্দেশ কেবল রমযানের জন্যই নয় বরং এক মু'মিনের জন্য এটি একটি স্থায়ী নির্দেশ। অতএব আমাদের প্রত্যেকের এই বিষয়টি অনুধাবন করা উচিত যে, নামায এবং ইবাদত খোদা তা'লার মৌলিক নির্দেশাবলীর অন্তর্গত। যেভাবে আজকাল আমাদের অধিকাংশ মানুষের এ কারণেই ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ হয়েছে যে, রমযান মাস কল্যাণের মাস আর দোয়া গৃহীত হওয়ার মাস। তাই আমাদেরও খোদার অনুগ্রহরাজিতে সিক্ত হওয়া উচিত আর এই রমযান মাস থেকে লাভবান হওয়া উচিত।

এ সম্পর্কে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, আমাদের হৃদয়ের গভীরতম স্থানেও খোদা তা'লার দৃষ্টি রয়েছে। তিনি আমাদের নিয়্যত বা উদ্দেশ্যকে জানেন এবং আমাদের কর্মকে আমাদের নিয়্যত বা উদ্দেশ্যের মাপকাঠিতে যাচাই করেন। অতএব আমাদের এই নিয়্যতে মসজিদ আবাদ করার প্রতি এবং ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত যে, আমরা আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করব আর এ মাসের ইবাদতসমূহকে জীবনের স্থায়ী অংশ বানানোর চেষ্টা করব। যদি তাহাজ্জুদের অভ্যাস গড়ে উঠে বা দিনের বেলা নফল পড়ার প্রতি মনোযোগ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে এই অভ্যাসকে স্থায়ী রূপ দেয়ার চেষ্টা করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ অর্থাৎ, হে মানব মণ্ডলি! তোমরা তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন আর তাদেরকেও যারা তোমাদের পূর্বে ছিল যেন তোমরা তাক্বওয়া অবলম্বন করতে পার।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এ প্রসঙ্গে এক জায়গায় বলেন, **"হে মানব মণ্ডলি! সেই খোদার উপাসনা কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের যোগ্য তিনিই যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ তিনিই চিরঞ্জীব, তাঁকেই ভালবাস।"** অতএব ঈমানদারী বা বিশ্বস্ততা হলো, খোদার সাথে বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন আর অন্য সবকিছুকে তাঁর মোকাবিলায় তুচ্ছ জ্ঞান করা। জ্ঞানগত ও বিশ্বাসগত চিন্তা-ধারার যতটুকু সম্পর্ক আছে আমরা সবাই জানি, আল্লাহ্ তা'লাই আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্ তা'লাই চিরঞ্জীব এবং তিনিই জীবন্ত খোদা। তিনিই দোয়া গ্রহণ করেন বা শোনেন আর তাঁকেই মন দেয়া উচিত বা ভালবাসা উচিত। কিন্তু তাসত্ত্বেও আমাদের বেশিরভাগ মানুষ খোদা তা'লার সাথে সেই বিশেষ সম্পর্ক বন্ধন রচনার চেষ্টা করে না যা করা আবশ্যক অর্থাৎ সেই সম্পর্ক যা অন্য সকল সম্পর্ককে আমাদের দৃষ্টিতে তুচ্ছ করে তুলবে। রমযানে একটি বিশেষ পরিবেশের প্রভাবে এদিকে পদচারণা আরম্ভ হয় আর রমযানের পর অধিকাংশের অবস্থা এমন হয় যে, গতি কমতে কমতে এক সময় এই পদচারণা বন্ধ হয়ে যায় বা থেমে যায়।

অতএব নিজেদের কর্মের মাধ্যমে আমাদের এটি প্রমাণ করার চেষ্টা করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া বাকি সব কিছুই তুচ্ছ আর এ বিষয়টি বুঝার জন্য হৃদয়ে তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতি সৃষ্টি করা আবশ্যক। আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে এ কথাই বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত কর যেন তোমাদের হৃদয়ে খোদার তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতি সৃষ্টি হয়। ইবাদতের উদ্দেশ্য কেবল খোদা তা'লাকে চেনা বা শনাক্ত করা নয় বরং তাক্বওয়া সৃষ্টি করে নিজেদের আধ্যাত্মিক উচ্চতা অর্জন করা, খোদা তা'লার গুণাবলী সম্পর্কে বুৎপত্তি অর্জন করা, এগুলোও ইবাদতের উদ্দেশ্য। আর যদি খোদার গুণাবলীর বুৎপত্তি অর্জন হয় কেবল তবেই তাঁর মোকাবিলায় সবকিছু তুচ্ছ প্রমাণিত হতে পারে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আল্লাহ্ তা'লা এখানে বলেছেন, তোমাদের রবের বা প্রভুর ইবাদত কর। 'রব' খোদা তা'লার সেই বৈশিষ্ট্য যা মানুষের প্রতিপালন করে, সৃষ্টি করে এবং এরপর ধীরে ধীরে তাকে উন্নতির উচ্চমার্গে নিয়ে যায়, তাকে ক্রমান্বয়ে উন্নতি দান করে।

অতএব এখানে যখন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমাদের প্রভুর ইবাদত কর তখন তিনি বলছেন, তোমাদের সকল প্রকার ভবিষ্যৎ উন্নতি তোমাদের প্রভুর সাথে সম্পৃক্ত এবং সংশ্লিষ্ট। আর তোমরা যখন বিশুদ্ধ চিত্তে কেবল স্বীয় প্রভুর ইবাদত করবে তখন যেখানে রবুবিয়্যত বৈশিষ্ট্যের সার্বজনীন কল্যাণে পৃথিবীর জাগতিক প্রতিপালন হবে সেখানে তোমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি-বৃত্তির উন্নতি এবং প্রতিপালনও হতে থাকবে। অতএব এতে আমাদের জন্য এই নসীহতও রয়েছে যে, যদি আমাদের আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি না হয় তাহলে আমরা নিজেদের ইবাদতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছি না এবং এর সহজাত ফলাফল স্বরূপ আমাদের প্রভুর আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থেকে আমরা কল্যাণমন্ডিত হচ্ছি না। আমরা যখন আমাদের প্রভুর ইবাদতের দায়িত্ব পালন করে তাঁর এই সিফত বা বৈশিষ্ট্য থেকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টিকোণ থেকে কল্যাণমন্ডিত হব বা কল্যাণ লাভ করব তখন তাক্বওয়ার ক্ষেত্রেও আমরা উন্নতি করব। আর তাক্বওয়ার ক্ষেত্রে উন্নতি করলে আমাদের ইবাদত তখন শুধু রমযান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকবে না বরং সারা বছর এবং সারা জীবনকে তা পরিবেষ্টন করবে। অতএব এই চিন্তা-চেতনা নিয়ে আমাদের ইবাদতের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, **"প্রকৃত কথা হলো, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হলো এই ইবাদত। অর্থাৎ জন্মের উদ্দেশ্য এটিই। যেভাবে অন্যত্র বলা হয়েছে,** وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ **অর্থাৎ আসলে ইবাদত হলো, সকল প্রকার কঠোরতা ও বক্রতা পরিহার করে হৃদয়-জমিনকে এমনভাবে পরিষ্কার করা যেভাবে এক কৃষক তার জমি পরিষ্কার করে থাকে।"**

এরপর তিনি (আ.) আরও বলেন, **"অতএব এটি কতইনা গুরুত্বপূর্ণ যেন তোমরা এটি অনুধাবন কর যে, তোমাদের সৃষ্টির পেছনে আল্লাহ্ তা'লার উদ্দেশ্য হলো, তোমরা যেন তাঁর**

ইবাদত কর এবং তাঁরই হয়ে যাও। এই বস্তুজগত যেন তোমাদের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য না হয়। আমি যে এই কথা বারবার বর্ণনা করি তার কারণ হলো, আমার মতে এটিই একমাত্র উদ্দেশ্য যার জন্য মানুষ এসেছে অথচ এটি থেকেই মানুষ যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে।" অতএব এদিকে অনেক বেশি মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন।

কতিপয় কর্মচারী এবং ওহদাদারদের সম্পর্কে যখন আমার কাছে এই অভিযোগ আসে যে, তারা নামাযে অলস, মসজিদে আসে না বা অনেকে এমন আছে যারা ঘরেও নামায পড়ে না আর তাদের স্ত্রীরাও অভিযোগ করে থাকে তখন আমি যারপর নাই লজ্জিত হই। অতএব আমাদের নিজেদের ইবাদতের বিষয়টি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন; এছাড়া তাক্বওয়া অর্জন হতে পারে না। আর যদি তাক্বওয়া না থাকে তাহলে মানুষ খোদার প্রাপ্য অধিকারও দিতে পারে না, তাঁর সৃষ্টির অধিকারও প্রদান করতে পারে না, জামাতের জন্যও সে কোন কল্যাণকর সত্তা হতে পারে না আর তার কাজ কোনভাবে কল্যাণকরও হতে পারে না।

অতএব আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত সচেতনতার সাথে নিজেদের ইবাদতের তত্ত্বাবধান এবং সুরক্ষা করা প্রয়োজন যেন আমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পারি আর আমাদের আধ্যাত্মিক উন্নতিও যেন হয়। এছাড়া আমাদের জন্য খোদা তা'লার আরও একটি নির্দেশ রয়েছে, তিনি বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ অর্থাৎ, হে যারা ঈমান এনেছ! আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস ঘাতকতা করো না নতুবা এর ফলে তোমরা নিজেদের আমানতের প্রতি জেনেশুনে বিশ্বাস ঘাতকতা মূলক আচরণ করবে।

অতএব এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ যা গভীর মনোযোগের দাবী রাখে। খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা শুধু বড় কথা বা বড় বিষয়েই সীমাবদ্ধ নয় বরং তুচ্ছ বিষয় থেকে আরম্ভ করে বড় বড় কথা এবং কাজও এর আওতাভুক্ত। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যিনি পবিত্র একটি জামাত প্রতিষ্ঠার জন্য এসেছিলেন তিনি তাঁর বয়আতের শর্তাবলীর দ্বিতীয় শর্তে আমাদের কাছ থেকে বিশেষভাবে খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা বর্জন এবং একে এড়িয়ে চলার অঙ্গীকার নিয়েছেন। প্রত্যেক পাপ তা ছোট হোক বা বড় সেটি পাপই। কিন্তু কোন কোন পাপ এমন যা থেকে নতুন নতুন পাপ সৃষ্টি হতে থাকে আর খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা সেই ধরনেরই একটি পাপ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিশ্বাস ঘাতকতার অভ্যাস নিজের আমানত এবং অবশ্য পালনীয় বিষয় সমূহের ক্ষেত্রেও খিয়ানতে প্রবৃত্ত করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লা বলেন, বিশ্বাসঘাতক আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের প্রাপ্য অধিকারও দিতে জানে না আর বান্দাদের অধিকারও প্রদান করতে পারে না। এক বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি যদি লক্ষ

বারও বলে যে, আমি নামায পড়ি, ইবাদত করি কিন্তু যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, ইবাদতের উদ্দেশ্য হলো তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতি সৃষ্টি করা আর তাক্বওয়ার অর্থই হলো, খোদা-প্রেম ও খোদা-ভীতির কারণে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করা। অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে বিশ্বাসঘাতকতা মানুষকে তাক্বওয়া থেকে দূরে ঠেলে দেয়। এটি হতেই পারে না যে, মানুষ বিশ্বাসঘাতকও হবে আর একই সাথে তাক্বওয়ার ওপর বিচরণকারীও হবে আর মানুষের অধিকারও যথাযথভাবে প্রদান করবে। আর এর সহজাত ফলাফলস্বরূপ এমন মানুষের ইবাদতও আল্লাহ্ তা'লা গ্রহণ করেন না। আবেদ বা ইবাদতকারী হওয়া তো দূরের কথা এক বিশ্বাসঘাতক তো ঈমানদারও আখ্যা পেতে পারে না।

মহানবী (সা.) একস্থানে বলেন, **"কোন ব্যক্তির হৃদয়ে ঈমান এবং কুফরী আর সত্যবাদিতা ও মিথ্যা একত্রিত হতে পারে না বা সহাবস্থান করতে পারে না।"** অনুরূপভাবে আমানত এবং খিয়ানতও একত্রিত হতে পারে না। তাই ঈমানের চিহ্ন হলো, সত্যতা এবং আমানত প্রত্যর্পণ বা ফেরত দেওয়া। এ কারণেই মহানবী (সা.) একস্থানে বলেন, মিথ্যা এবং বিশ্বাস ঘাতকতা ছাড়া অন্য বদভ্যাস মু'মিনের মাঝে থাকতে পারে কিন্তু এ দু'টো বদভ্যাস এক মু'মিনের মাঝে থাকতে পারে না। যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী এবং বিশ্বাসঘাতক সে মু'মিন নয়। আমানতের সুরক্ষা বা আমানতের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া এবং বিশ্বাস ঘাতকতা এড়িয়ে চলার বিষয়টি অনেক ব্যাপক একটি বিষয়। আর এক মু'মিনের কাছে আশা করা হয় যে, সে এর গুরুত্ব এবং ব্যাপকতা অনুধাবন করবে। আর এটি বুঝার জন্য মহানবী (সা.)-এর এই উক্তি বিষদভাবে এ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। তিনি (সা.) বলেন, **"তিনটি বিষয়ে মুসলমানের হৃদয় বিশ্বাস ঘাতকতার আশ্রয় নিতে পারে না। প্রথমতঃ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টির সন্ধানে কাজের ক্ষেত্রে নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা প্রদর্শন। দ্বিতীয়তঃ সকল মুসলমানের মঙ্গল কামনা। তৃতীয়তঃ জামাতবদ্ধভাবে জীবন যাপন করা।"** অতএব এতে খোদার প্রাপ্য অধিকারের কথাও রয়েছে, বান্দার অধিকার প্রদানের কথাও বলা হয়েছে আর জামাতের প্রতি বিশ্বস্ততার দিকটাও রয়েছে। এই তিনটি বিষয়ই এর অন্তর্গত।

আল্লাহ্ তা'লার অধিকার প্রদানের ক্ষেত্রে ইবাদতের পাশাপাশি সেসব দায়িত্বও এসে যায় যা খোদার ধর্মের খিদমতকারীদের ওপর ন্যস্ত করা হয়। ওহদাদারদের ওপর যেসব আমানত ন্যস্ত করা হয়েছে নিজেদের সেসব আমানত যথাযথভাবে প্রত্যর্পণের বিষয়টি যদি প্রত্যেকে নিজেই খতিয়ে দেখে, প্রত্যেক সেবক বা খিদমতকারী যদি নিজেই তা বিশ্লেষণ করে আর আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া বা খোদা-ভীতিকে সামনে রেখে যদি এই কাজ করে তাহলে সে নিজেই বুঝতে পারবে যে, সেই আমানতের সে কতটা সুরক্ষা করছে যা তার ওপর ন্যস্ত করা হয়েছে বা সে এর প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল।

এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) একথাও বলেছেন, যদি তোমরা নিজ ভাইদের অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না কর তাহলে এটিও এক প্রকার খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা। তোমাদের জিহ্বা এবং হাত দ্বারা যদি অন্যরা কষ্ট পায়, তাহলে এক মুসলমান হিসেবে তোমার ওপর যে দায়িত্ব বর্তায় সেই দায়িত্ব তুমি পালন করছ না আর অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করে তুমি খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করছ। বরং এক বর্ণনায় মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, এক মুসলমানের জন্য আবশ্যক হলো তার হাত এবং জিহ্বা থেকে যেন অন্যরা নিরাপদ থাকে।

অতএব প্রত্যেক মানুষের অধিকার প্রদান করা এক মুসলমানের জন্য আবশ্যক আর সেই অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান না করা তাকে বিশ্বাসঘাতক সাব্যস্ত করে। এছাড়া একজন আহমদীর জন্য জামাতী ব্যবস্থাপনা মেনে চলা এবং নিজ বয়আতের অঙ্গীকার রক্ষা করা আবশ্যক। জামাতের প্রত্যেক সদস্য নিজ নিজ অঙ্গ সংগঠনের ইজতেমায় এই অঙ্গীকার করে যে, সে জামাতের ব্যবস্থাপনা মেনে চলবে। তাই এই অঙ্গীকারও এক প্রকার আমানত এবং এটি রক্ষা করা আবশ্যক। নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ্য নিয়োজিত করে এটি রক্ষা করা উচিত। খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ততা এবং আনুগত্যও আবশ্যক, আহাদনামায় এই অঙ্গীকারও করা হয়। আমানত রক্ষার ক্ষেত্রে এ কথাও স্মরণ রাখা উচিত, পারিবারিক জীবনে ছেলে এবং মেয়ে যখন বৈবাহিক বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখন পরস্পরের ওপর পরস্পরের কিছু অধিকার রয়েছে; সেই অধিকার প্রদানও এক প্রকার আমানত। পারিবারিক জীবনে স্বামীর ওপর যে সকল আমানত রয়েছে তার মাঝে উদাহারণস্বরূপ মহিলার মোহরানা রয়েছে যা তার পরিশোধ করা উচিত।

এমন অনেক কেইস এসে থাকে যে, যখন ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায় তখন মোহরানা না দেয়ার চেষ্টা করা হয়। রসূল করীম (সা.) এই বিষয়ে এটি পর্যন্ত বলেছেন, **“যে ব্যক্তি কোন মহিলার সাথে বিয়ের জন্য মোহরানা নির্ধারণ করে আর তার নিয়্যত এটি থাকে যে, সে তা পরিশোধ করবে না তাহলে এমন ব্যক্তি ব্যভিচারী। আর যে ব্যক্তি কারও কাছ থেকে ঋণ ফেরত না দেয়ার মানসে ঋণ নেয় এমন ব্যক্তি চোর।”**

এরপর দেখুন! মহানবী (সা.) আমাদের কাছে আমানতের মানকে কোন পর্যায়ে উপনীত করার আশা রেখেছেন এবং তাকিদ করেছেন। তিনি (সা.) বলেন, “যার কাছে তার মুসলমান ভাই কোন পরামর্শ চায় আর সে যদি না বুঝে কোন পরামর্শ দেয় তাহলে সে তার সাথে খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করেছে। অর্থাৎ যদি সকল তথ্য-উপাত্ত সামনে রেখে সঠিকভাবে পরামর্শ না দেয় তাহলে এটি খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতার নামান্তর। কেউ কেউ এমন হয়ে থাকে যে, অন্যরা যখন তাদেরকে বিশ্বাস করে, তাদের কাছে পরামর্শ চায় তখন সঠিক পরামর্শ দেয় না। অতএব আমানত রক্ষা বলতে যা বুঝায় তাহলো, যদি কোন বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকে তাহলে ক্ষমা চেয়ে নিন।

আর যদি কোন উত্তম পরামর্শদাতার কথা জানা থাকে তাহলে তার ঠিকানা বলে দেয়া উচিত বা তার কাছে পাঠানো যেতে পারে।

আমি অনেক উকিলকে দেখেছি, তারা এখানে রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনাকারীদের ভুল পরামর্শ দেয় বা পুরো আন্তরিকতার সাথে পরামর্শ দেয় না। নিজেদের ফিস ঠিকই পুরোপুরি নেয়। তারা সেসব লোকদের অন্তর্ভুক্ত যারা খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করছে। অনুরূপভাবে আরও অনেক বিষয় রয়েছে। অতএব এমন লোকদের ভাবা উচিত, এক ব্যক্তি যখন বিশ্বাস করে আপনার কাছে আসে তখন তাকে সঠিক পথ দেখান নতুবা আল্লাহ্‌র রসূলের সিদ্ধান্ত অনুসারে এমন ব্যক্তি খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করছে।

অতএব এসব বিষয়ে অনেক সাবধানতার প্রয়োজন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদের মাঝে আমানত প্রত্যর্পণ এবং বিশ্বাস ঘাতকতা এড়িয়ে চলার ক্ষেত্রে কি মান দেখতে চান তা দেখুন! তিনি (আ.) একস্থানে বলেন, **“যে ব্যক্তি কুদৃষ্টি, বিশ্বাস ঘাতকতা, ঘুষ এবং সকল প্রকার অবৈধ তসরুফ বা কাজ থেকে তওবা করে না সে আমার জামাতভুক্ত নয়।”** তিনি (আ.) আরও বলেন, **“প্রত্যেক সেই পুরুষ যে স্ত্রীর সাথে এবং স্ত্রী স্বামীর সাথে বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে আমার জামাতভুক্ত নয়।”** তিনি (আ.) আরও বলেন, **“আল্লাহ্ তা’লাকে এক ও অ-দ্বিতীয় মানার পাশাপাশি আবশ্যকীয় বিষয় হলো, তাঁর সৃষ্টির অধিকার খর্ব না করা। যে ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে এবং খিয়ানত বা বিশ্বাস ঘাতকতা করে সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’-এ বিশ্বাসী নয়।”** তিনি (আ.) আরও বলেন, **“আল্লাহ্ তা’লা পবিত্র কুরআনে তাক্বওয়াকে পোষাক নামে অভিহিত করেছেন। দেখুন! ‘লেবাসুত্ তাক্বওয়া’ কুরআনেরই শব্দ। এটি এ কথার প্রতিই ইঙ্গিত করে যে, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য এবং আধ্যাত্মিক শোভা তাক্বওয়ার মাধ্যমেই সৃষ্টি হয় আর তাক্বওয়া হলো, মানুষ যেন খোদা তা’লা কর্তৃক ন্যস্ত সকল আমানত এবং ঈমানী অঙ্গীকার আর একইভাবে সৃষ্টির সাথে সম্পৃক্ত সকল আমানত ও অঙ্গীকারের প্রতি যধাসাধ্য যত্নবান থাকা অর্থাৎ এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দিকগুলোর ওপর যথাসাধ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়া।”**

অতএব আমানতের সূক্ষ্ম দিক সমূহ সন্ধান করে সেগুলোর ওপর আমল করা আমাদেরকে আমানত প্রদানকারীর আসনে আসীন করে যার জন্য আমাদের চেষ্টা করা উচিত। সকলের প্রাপ্য অধিকার প্রদান যা আমাদের দায়িত্ব তা একটি আমানত। সকল আবশ্যকীয় দায়িত্ব যা আমাদের ওপর ন্যস্ত হয়েছে এগুলো এক আমানত আর তা পালন করা আমাদের জন্য ফরয বা আবশ্যক। আর আমরা যদি খোদা তা’লার কৃপাবারির অধিকারী হতে চাই তাহলে এই আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করা জরুরী বা অবধারিত।

অতএব আমাদের প্রত্যেককে এর প্রতি গভীর মনোযোগ দেয়া প্রয়োজন। এরপর খোদা তা'লার আরও একটি নির্দেশ আজ বর্ণনা করার জন্য নিয়েছি যা সমাজের শোভা এবং সৌন্দর্য্য বর্ধন করে। আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেন, الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ অর্থাৎ, যারা স্বাচ্ছন্দ্যেও খরচ করে এবং অস্বাচ্ছন্দ্যেও খরচ করে আর যারা ক্রোধ সংবরণ করে এবং মানুষকে মার্জনা করে। আর আল্লাহ্ তা'লা অনুগ্রহশীলদের ভালবাসেন।

যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদান করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরয বা আবশ্যক। অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের মানদন্ড কি হওয়া উচিত তা আল্লাহ্ তা'লা এই আয়াতে সুস্পষ্ট করেছেন বরং আরও গভীরে গিয়ে আমাদেরকে এই নসীহত করেছেন যে, অধিকার বা প্রাপ্য প্রদানের চেয়েও অগ্রসর হয়ে ত্যাগ বা কুরবানীর ফলে সমাজের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। শুধু অধিকার বা প্রাপ্যই দেবে না বরং অনেক সময় প্রাপ্য বা অধিকার প্রদানের জন্য ত্যাগও স্বীকার করতে হয়। যে সমাজের প্রতিটি সভ্য বা ব্যক্তি শুধু পরস্পরের অধিকারই প্রদান করে না বরং কুরবানী বা ত্যাগ স্বীকারের মন মানসিকতা নিয়ে যদি অধিকার প্রদান করে তাহলে সেই সমাজ সত্যিকার অর্থে সেই মানে উপনীত হয় যাকে আমরা বলতে পারি, এটি জান্নাতের মতো সমাজ বা জান্নাত প্রতীম সমাজ। এর দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর সাহাবীদের মাঝে দেখতে পাই যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লাও বলেছেন, وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ অর্থাৎ, আর দরিদ্র হওয়া সত্ত্বেও তারা অন্যদেরকে নিজেদের ওপর প্রাধান্য দেয়।

অতএব এমন চিন্তা-চেতনা এবং এমন আমল বা কর্ম যদি হয় তাহলেই ত্যাগের প্রেরণা সৃষ্টি হয়, প্রবৃত্তির কামনা-বাসনাকে মানুষ পিষ্ট করে, অন্যের মঙ্গল কামনা করে আর অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করে। এরূপ চারিত্রিক মাহাত্ম্যের সবচেয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত আমরা মহানবী (সা.)-এর যাপিত জীবনে দেখতে পাই। আমরা দেখি, তিনি (সা.) তাঁর কন্যার হত্যাকারীকেও ক্ষমা করে দিয়েছেন আর এমনই আরও অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। এছাড়া রাগ এবং ক্রোধ সংবরণ আর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলী প্রদর্শনের জন্য তিনি কীভাবে তাঁর সাহাবীদের নসীহত করেছেন এবং তরবীয়ত করেছেন তা দেখুন! একটি প্রসিদ্ধ ঘটনা রয়েছে যে, **"এক ব্যক্তি হযরত আবু বকর (রা.)-কে মহানবী (সা.)-এর উপস্থিতিতে আজেবাজে কথা বলা আরম্ভ করে। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) নিরব ছিলেন। মহানবী (সা.) সেখানে উপবিষ্ট ছিলেন আর সেই ব্যক্তির কথা শুনে মুচকি হাসছিলেন। সেই ব্যক্তির অন্যায় যখন সীমা ছাড়িয়ে যায় তখন হযরত আবু বকর (রা.) কঠোর ভাষায় সেই ব্যক্তির কিছু কথার উত্তর দেন। তখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র চেহারায় অসন্তোষের ছাপ প্রকাশ পায় আর তিনি সেখান থেকে উঠে চলে যান। পরবর্তীতে হযরত আবু বকর (রা.) মহানবী (সা.)-**

এর কাছে উপস্থিত হয়ে বলেন, সেই ব্যক্তি আপনার উপস্থিতিতে আমাকে আজেবাজে কথা বলছিল অথচ আপনি বসে ছিলেন। কিন্তু আমি যখন তার কিছু কথার উত্তর দিলাম তখন আপনি রাগ করে সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। তখন মহানবী (সা.) বলেন, সে যখন গালি দিচ্ছিল আর তুমি নিরব ছিলে তখন খোদা তা'লার এক ফিরিশ্‌তা তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিল। কিন্তু তুমি যখন পাল্টা উত্তর দিলে তখন ফিরিশ্‌তা চলে যায় আর শয়তান সেই স্থান নিয়ে নেয়।" আর এটি জানা কথা যে, এরপর মহানবী (সা.)-এর সেখানে বসার কোন যৌক্তিকতা ছিল না।

অতএব মহানবী (সা.) এভাবে সাহাবীদের তরবীয়ত করেছেন, তাদের বৈধ রাগ এবং ক্রোধকেও মার্জনায় বদলে দিয়েছেন বরং তাদেরকে ইহসান বা অনুগ্রহ করার রীতি শিখিয়েছেন। মহানবী (সা.)-এর ব্যক্তিগত অবস্থা সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, **"তিনি (সা.) কখনও নিজের খাতিরে তাঁর ওপর কৃত কোন যুলুম বা অন্যায়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি।"**

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, **"আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য প্রাপ্তদেরকে অনেক বড় বড় গালি দেয়া হয়েছে, অনেক মারাত্মকভাবে দুঃখ-যন্ত্রণা দেয়া হয়েছে কিন্তু তাদেরকে এই নির্দেশই দেয়া হয়েছে যে, وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ স্বয়ং সেই পূর্ণ মানব আমাদের নবী (সা.)-কে খুবই ভয়াবহ কষ্ট দেয়া হয়েছে এবং গালি, নোংরা ভাষা ও ঔদ্ধত্ব প্রদর্শন করা হয়েছে কিন্তু উন্নত নৈতিক গুণাবলীর মূর্তপ্রতীক সেই সত্তা এর মোকাবিলায় কি করেছেন? তাদের জন্য দোয়া করেছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা যেহেতু এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, তুমি যদি অজ্ঞদের অবজ্ঞা কর বা এড়িয়ে চল তাহলে আমরা তোমার সম্মান এবং প্রাণের নিরাপত্তা বিধান করব আর এসব বাজারী মানুষ তোমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না আর তাই হয়েছে। মহানবী (সা.)-এর বিরোধীরা তাঁর কোন সম্মানহানী করতে পারেনি বরং নিজেরাই লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হয়ে তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়েছে বা তাঁর সামনেই ধ্বংস হয়েছে।"**

এরপর মহানবী (সা.)-এর এই নিবেদিত প্রাণ দাসের ব্যক্তিগত আদর্শ কেমন ছিল এর একটি দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করছি। ডক্টর মার্টিন ক্লার্ক হত্যা সংক্রান্ত মামলায় খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভী সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হন তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর উকীল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব যিনি একজন অ-আহমদী ভদ্র মানুষ ছিলেন, তিনি মৌলভী মুহাম্মদ হোসেন বাটালভীর সাক্ষ্যকে দুর্বল করার জন্য আদালতে মৌলভী সাহেবের কাছে তার বংশ সম্পর্কে এমন কিছু তীর্যক প্রশ্ন করেন। তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) তাৎক্ষণিকভাবে তাঁর উকিলকে বাঁধা দেন এবং বলেন, মৌলভী সাহেবকে এমনভাবে জেরা করার অনুমতি আমি আপনাকে কিছুতেই দিতে পারি না। আর এটি বলতে গিয়ে তিনি (আ.) নিজের হাত তাৎক্ষণিকভাবে উকীল মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেবের মুখের ওপর রেখে দেন। এটি সেই উন্নত

নৈতিক চরিত্র যে, নিজেকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়েও তিনি (আ.) নিজের প্রাণের শত্রুর সম্মান ও সম্ভ্রমের সুরক্ষা করেছেন।

মৌলভী ফযল দ্বীন সাহেব সবসময় এই ঘটনার উল্লেখ করতেন যে, মির্যা সাহেব অদ্ভুত ও বিস্ময়কর চরিত্রের অধিকারী এক মানুষ। এক ব্যক্তি তাঁর সম্মান বরং জীবনের ওপর আঘাত হানছে; তার বিরুদ্ধে তার সাক্ষ্যকে দুর্বল করার জন্য কিছু প্রশ্ন করা হলে তিনি তাৎক্ষণিকভাবে এই বলে বাঁধা দেন যে, আমি এমন প্রশ্ন করার অনুমতি দিতে পারি না। অতএব এটি হলো সেই মর্যাদা যা ক্রোধ দমন ও মার্জনা বরং অনুগ্রহেরও দৃষ্টান্ত। যা এযুগে মহানবী (সা.)-এর নিবেদিত প্রাণ দাসের জীবনে বা জীবন চরিতে আমরা দেখতে পাই।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ **অর্থাৎ, তারাই মু'মিন যারা ক্রোধ সংবরণ করে আর অপলাপকারী অত্যাচারীদের ক্ষমা করে এবং বাজে কথার মাধ্যমে বাজে কথার উত্তর দেয় না।** জামাতকে নসীহত করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, **"এই জামাত প্রতিষ্ঠার মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে, মুখ, কান, চোখ তথা সকল অঙ্গে যেন তাক্বওয়া প্রবেশ করে। তার ভেতর এবং বাহিরে যেন তাক্বওয়ার জ্যোতি বিরাজ করে। সে যেন উন্নত চরিত্রের মহান আদর্শ হয়। অযথা রাগ এবং ক্রোধ যেন আদৌ না থাকে।"**

তিনি (আ.) আরো বলেন, **"আমি দেখেছি যে, জামাতের অধিকাংশ সদস্যের মাঝে এখনও রাগ এবং ক্রোধের ব্যাধি রয়েছে। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে হিংসা-বিদ্বেষ দানা বাঁধে এবং পরষ্পর ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত হয়। এমন লোকদের জামাতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। আমি বুঝি না, কেউ যদি গালি দেয় তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তি নিরব থাকলে বা এর উত্তর না দিলে সমস্যা কোথায়। প্রত্যেক জামাতের সংশোধন প্রথমে চারিত্রিক সৌন্দর্য্যের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। প্রথমে ধৈর্য্যের মাধ্যমে তরবীয়তের ক্ষেত্রে উন্নতি করা উচিত আর এর সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো, কেউ যদি বাজে কথা বলে তাহলে তার জন্য হৃদয়ে বেদনা নিয়ে দোয়া করা যে, আল্লাহ্ তা'লা তার সংশোধন করুন। আর হৃদয়ে হিংসা বিদ্বেষকে কোনভাবেই যেন বৃদ্ধি পেতে না দেয়। যেভাবে পৃথিবীর বা জাগতিক আইন আছে সেভাবে আল্লাহ্ তা'লারও আইন আছে। এই জগত যেখানে নিজের আইন পরিত্যাগ করে না সেখানে আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে নিজের আইন পরিত্যাগ করতে পারেন। অতএব যতক্ষণ পরিবর্তন না আসবে ততক্ষণ তাঁর দৃষ্টিতে তোমাদের কোন মূল্য নেই। আল্লাহ্ তা'লা আদৌ এটি পছন্দ করেন না যে, নমনীয়তা, ধৈর্য্য এবং মার্জনা যা উন্নত গুণাবলী সেগুলোর স্থান নেবে পাশবিকতা। যদি তোমরা এসব উৎকৃষ্ট নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রে উন্নতি কর তাহলে অচিরেই আল্লাহ্ তা'লা পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।"**

আল্লাহ্ তা'লা এই রমযানে আমাদেরকে ইবাদতের মান উন্নত করার এবং সেগুলোতে অবিচল থাকার তৌফিক দানের পাশাপাশি আমাদের অন্যান্য চারিত্রিক গুণাবলী এবং প্রাপ্য অধিকার প্রদান নিশ্চিত করার এবং সেগুলোকে স্থায়ী বৈশিষ্ট্যে রূপ দেয়ার তৌফিক দান করুন। আর আমি যেমনটি বলেছি, আমাদের সকল কর্মী যারা কোন না কোনভাবে জামাতের কাজ করছেন তাদের নিজ ঘরেও আর বাইরেও সর্বপ্রথম নিজেদের দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করা উচিত।

দোয়ার প্রতি পুনরায় মনোযোগ আকর্ষণ করছি, রমযানের প্রথম খুতবায়ও বলেছিলাম সংক্ষেপে আবারও বলছি, নিজেদের জন্য দোয়ার পাশাপাশি জামাতের উন্নতি এবং শত্রুর ভয়াবহ ষড়যন্ত্র থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আজকাল অনেক বেশি দোয়া করুন আর ইসলামের বিশ্ববিজয়ের জন্যও অনেক দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।